বাঙালীত্বের আয়নায় দ্বারকানাথ

হরিশংকর জলদাস

[*নতুন দিগন্তে*'র গত সংখ্যায় (সপ্তদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা) দ্বারকানাথ ঠাকুরকে নিয়ে আলোচনা করেছেন ইতিহাসবিদ গোলাম আহমাদ মোর্তজা; বর্তমান সংখ্যায় লিখছেন কথাসাহিত্যিক হরিশংকর জলদাস। দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গিতে ভিন্নতা রয়েছে। যে জন্য তাঁদের মূল্যায়নও হয়েছে দু'রকমের। ইতিহাসের চর্চায় মতভিন্নতার দ্বান্দ্বিকতা খুবই জরুরী। দ্বারকানাথ ঠাকুরের মূল্যায়নের ব্যাপারে এই মতভিন্নতা সহায়ক হবে বলে আমাদের ধারণা। মূল্যায়নের এই দ্বৈত প্রচেষ্টার বিষয়ে পাঠকের প্রতিক্রিয়া পেলে আমরা খুশি হবো। সম্পাদক।]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীয়ানার স্ফূরণ ঘটিয়েছিলেন যে ক'জন হাতে গোনা বাঙালী, তাঁদেরকে নতুন করে জানার, নতুন করে বোঝার সময় এসেছে। তাঁরা সময়ের রূঢ় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, বাস্তবতার কাঠিন্যকে অতিক্রম করে আমদের দরজার কড়া নাড়ছেন। অর্গল খুলে তাঁদেরকে স্বাগত জানানো প্রত্যেক বাঙালীদের জন্য এই মুহূর্তের জরুরী কাজগুলোর একটি। এঁদের অন্যতম দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬), তাঁর সম্পর্কে নানা রকম বিচিত্র কথা, মনোরম ঘটনা প্রচলিত আছে। কোন ঘটনা বাস্তব, কোনটা কাল্পনিক। নানা কারণে .তিনি স্বদেশে, স্বগৃহে নন্দিত ও নিন্দিত। সেই ঊনিশ শতকে ইউরোপীয়রা দ্বারকানাথকে কিভাবে মূল্যায়ন করে গেছেন এই লেখাটিতে দেখার চেষ্টা করবো।

'হৈমন্তী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি স্নিগ্ধ অথচ রক্তাক্ত, সুরভিত অথচ বেদনামুখর গল্প। এ গল্পের নায়ক অপুর মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলিয়েছেন, "তাঁহার পিতা ছিলেন উগ্রভাবে সমাজবিদ্রোহী; দেশের প্রচলিত ধর্মকর্মে কিছুতেই তাঁহার আস্থা ছিল না; তিনি কষিয়া ইংরাজী পড়িয়াছিলেন। আমার পিতা উগ্রভাবে সমাজের অনুগামী; মানিতে তাঁহার বাধে এমন জিনিস আমাদের সমাজে, সদরে বা অন্দরে, দেউড়ি বা খিড়কির পথে খুঁজিয়া পাওয়া দায়, কারণ ইনিও কষিয়া ইংরাজী পড়িয়াছিলেন। পিতামহ এবং পিতা উভয়েরই মতামত বিদ্রোহের দুই বিভিন্ন মূর্তি।" এ অংশটি পড়তে পড়তে অপুকে আমার রবীন্দ্রনাথ বলে মনে হয়েছে, আর 'পিতামহে'র জায়গায় দ্বারকানাথ ঠাকুরের কথা স্মরণে ভেসে উঠেছে। গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথের কলমের সামান্য আঁচড়ে 'পিতামহে'র যে ছবি স্পষ্ট হয়েছে, তাতে মনে হয়েছে 'পিতামহ' একজন প্রগতিশীল আধুনিক মানুষ; যেমনটি ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ দ্বারকানাথের আদলে 'পিতামহ'কে এঁকেছেন। প্রকৃতপক্ষে,

দ্বারকানাথ ছিলেন অন্যরকম, ভিন্ন মাত্রার একজন বাঙালী। তাঁর বাইরের আভরণ-আচরণ ছিল সাহেবদের মতো, কিন্তু অন্তরের উপাদান-উপকরণ ছিল একজন খাঁটি বাঙালীর মতো। তিনি ছিলেন কল্পনাপ্রবণ কিন্তু সংযত; উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না তিনি, কিন্তু বুদ্ধিতে ছিলেন দীপ্তিমান। সমাজের মানবতাবিরোধী লক্ষ্মণরেখাকে অতিক্রম করতে পারলেই তাঁর সমস্ত উল্লাসবোধ উচ্চকিত হয়ে উঠত। সঙ্গীত বিষয়ে তিনি ছিলেন তদ্‌গতপ্রাণ। সঙ্গীত বিষয়ে তাঁর অনুসন্ধিৎসা ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে ফ্রান্স ও ইতালী পর্যন্ত উঁকি দিয়েছিল। তিনি ছিলেন অভিজাত ও রোমান্টিক।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনীর প্রতি আলোর মোটারশ্মি ফেললে এ তথ্যগুলো বেরিয়ে আসে।

নীলমণি ঠাকুরের পাঁচ পুত্র—রামতনু, রামরতন, রামলোচন, রামমণি ও রামবল্লভ। তৃতীয় ভ্রাতা রামলোচনের একমাত্র কন্যার মৃত্যু হলে রামলোচন রামমণির দ্বিতীয়পুত্র দ্বারকানাথকে দত্তক গ্রহণ করেন, সেটা ১৭৯৯ সাল। কালান্তরে রামলোচন দ্বারকানাথকে তাঁর বিশাল সম্পত্তি উইল করে দেন। এই উইল করার কয়েক দিন পরেই ১৮০৭ সালের ১২ ডিসেম্বর রামলোচনের মৃত্যু হয়। দ্বারকানাথের বয়স তখন ১৩ বছর।

বাল্যবয়সে দ্বারকানাথ আরবী ও ফারসী ভাষা আয়ত্ত করেন। ইংরেজী ভাষা শেখানোর উদ্দেশ্যে তাঁকে সেরবোর্ন সাহেবের স্কুলে ভর্তি করানো হয়। পরে দ্বারকানাথ রাজা রামমোহনের বন্ধু উইলিয়ম অ্যাডাম্‌স্ এবং জে.জি. গর্ডন ও জেম্‌স্ কলডর প্রমুখের কাছে ইংরেজী শেখেন।

জে. জি. গর্ডন ও জেম্‌স্ কলডর ছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত সওদাগরী প্রতিষ্ঠান 'ম্যাকিনটশ অ্যান্ড কোম্পানীর' অংশীদার। তাঁদেরই সহায়তায় দ্বারকানাথ এই কোম্পানীর গোমস্তা হন। পরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিজেই রেশম ও নীল ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা শুরু করেন। ১৮১৮ সালে দ্বারকানাথ চব্বিশ পরগণার কালেক্টরের অফিসে সেরেস্তাদার নিযুক্ত হন। দ্বারকানাথ ১৮৩০ সালে কালীগ্রাম এবং ১৮৩৪ সালে সাহাজাদপুর পরগণার জমিদারী ক্রয় করেন। তিনি ১৬ লক্ষ টাকা মূলধন দিয়ে 'দ্বারকানাথ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠা করেন। উইলিয়ম কারের সহায়তায় 'কার-ঠাকুর কোম্পানীর' পত্তন করেন। পরে তিনি জাহাজ ব্যবসায়ে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর নিজেরই একটা জাহাজ ছিল এবং 'ইন্ডিয়া' নামের সেই জাহাজে করে তিনি প্রথমবার ইংল্যান্ডে যান।

১৮১৪ সালে রংপুরের কালেক্টরের অফিসের সেরেস্তাদারের কাজ ছেড়ে রামমোহন কলকাতায় চলে এলে দ্বারকানাথের সাথে তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়। রামমোহন দ্বারকানাথের চেয়ে ২২ বছরের বড় ছিলেন; কিন্তু উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক

ছিল অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো। প্রশান্তকুমার পাল *রবিজীবনী*র প্রথম খণ্ডে লিখেছেন, 'রামমোহন ও দ্বারকানাথ এই জুড়ি ঘোড়ার টানেই আধুনিক সভ্যতার রথ বাংলাদেশে প্রথম প্রবেশ করেছিল।' প্রশান্তকুমার পাল আরও লিখেছেন, "হিন্দুধর্মের সংস্কার ও সতীদাহ নিবারণ—রামমোহনের এই দুটি কীর্তির সঙ্গেও দ্বারকানাথ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। রামমোহন ১৮১৫-এ একেশ্বরবাদী হিন্দুধর্ম বিষয়ে আলোচনার জন্য 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করেন। দ্বারকানাথ নিজে নিষ্ঠাবান মূর্তিপূজক হিন্দু হয়েও এইসব আলোচনায় যোগ দিতেন এবং যখন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হয় তখন তিনি যথেষ্ট সহযোগিতা করেন ও পরে নিয়মিত উপাসনাতেও উপস্থিত থাকতেন। রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর কয়েক বছর প্রধানত তাঁর দানের উপর নির্ভর করেই ব্রাহ্মসমাজ বেঁচে থাকতে পেরেছিল। অনুরূপভাবে সতীদাহ নিবারণের ব্যাপারেও দ্বারকানাথ সর্বপ্রযত্নে রামমোহনকে সাহায্য করেছিলেন। এছাড়া মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার, বেন্টিঙ্কের প্রতি বিদায়কালীন অভিনন্দন, কালা আইন, দেওয়ানী জুরির প্রবর্তন, পুলিশ সংস্কার প্রভৃতি রাজনৈতিক আন্দোলনের কোথাও স্বপক্ষে বা কোথাও বিপক্ষে দ্বারকানাথকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা যায়। বাংলাদেশের জমিদারদের শক্তিকে সংহত করতে এবং তাঁদের সমস্যা সম্পর্কে সরকারকে সচেতন করার জন্য ১৯৩৮-এ যে জমিদার সভা বা ল্যান্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করা হয়, দ্বারকানাথ তার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।"

আনুমানিক ১৮০৯ সালে যশোরের মেয়ে দিগম্বরী দেবীকে দ্বারকানাথ বিয়ে করেন। তিনি যেমন ছিলেন অনিন্দ্যসুন্দরী, তেমনি ছিলেন নিষ্ঠাবর্তী ও ওজস্বিনী। স্বামীর মদ্যমাংসের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি দেখে দিগম্বরী দ্বারকানাথের সাক্ষাৎ সম্পর্ক ত্যাগ করেন। দ্বারকানাথও পত্নীর বিশ্বাসের ওপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করে বৈঠকখানাতেই বসবাস শুরু করেন। দিগম্বরী দেবীর গর্ভে দ্বারকানাথের পাঁচটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করেন—দেবেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ। ১৮৩৯ সালের ২১ জানুয়ারী দিগম্বরী দেবীর মৃত্যু হয়। এর প্রায় ৩ বছর পর ১৮৪২ সালের ৯ জানুয়ারী দ্বারকানাথ বিলেত যাত্রা করেন। দ্বারকানাথের ইউরোপ যাওয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ফ্যানি পার্কস তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, "দ্বারকানাথ দু'বছরের জন্য ইউরোপ যাচ্ছেন। ফ্রান্সের রাজার সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করবেন। যে চুম্বকের আকর্ষণে প্রাচ্যের এই জ্ঞানী পুরুষটি যাচ্ছেন তা হলো সেখানকার নর্তকীদের রূপ-লাবণ্য। তিনি বলেছেন, বিশ্বের সেরা সুন্দরী তিনশো নর্তকী শোভিত প্যারিস অপেরা তিনি দেখবেন। এ ব্যাপারে বাবুটি বেশ পাকা লোক।"

দ্বারকানাথের ইউরোপ যাত্রা সম্পর্কে প্রশান্তকুমারের ভাষা অবশ্য ভিন্ন রকমের।

তিনি লিখেছেন, "ইংলন্ডে দ্বারকানাথ বিপুল সংবর্ধনা লাভ করেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং তাঁকে অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁর অনুমতিক্রমে ইংলন্ডের মার্শাল ডিউক অব্ নরফোক তাঁকে একটি 'আর্মেরিয়াল এনসাইন' দেন। লন্ডনের মেয়র তাঁকে একটি ভোজসভায় আপ্যায়িত করেন। স্কটল্যান্ডে গেলে তাঁকে এডিনবরা মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে সেই মহানগরীর নাগরিক অধিকার প্রদান করা হয়। ফ্রান্সের সম্রাট লুই ফিলিপ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। তিনিও একটি সান্ধ্যভোজে সম্রাট ও বিশিষ্ট অতিথিদের যথেষ্ট আপ্যায়িত করেন।" ম্যাক্সমুলার সেই সান্ধ্যভোজের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন, "প্যারিসে অবস্থানকালে দ্বারকানাথ প্রাচ্যের খাঁটি আভিজাত্য বজায় রেখেছিলেন। এক সান্ধ্য মজলিসে স্বয়ং সম্রাট লুই ফিলিপ ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে তাঁকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান। তদানীন্তন ফরাসী মহিলাদের যা ছিল সর্বাপেক্ষা কাম্যবস্তু, সেই ভারতীয় শাল দিয়ে সভাকক্ষ সাজানো হয়েছিল এবং সভাশেষে মহিলারা যখন একে একে বিদায় নিলেন, তখন তাঁদের প্রত্যেকের গায়ে একটি করে শাল তিনি পরিয়ে দিলেন।"

ম্যাক্সমুলার পণ্ডিতব্যক্তি। ভারততত্ত্ববিদ্ হিসেবে তাঁর খ্যাতি। বেদ-উপনিষদ পুনরুদ্ধার করে টীকাটিপ্পনী সহ মুদ্রণের প্রথম উদ্যোগ নেন ম্যাক্সমুলারই। তিনি কোনোদিন ভারতে আসেন নি, কিন্তু তৎকালীন ভারতীয় পণ্ডিত ও সমাজ সংস্কারকদের সাথে তাঁর নিবিড় পত্রালাপ ছিল। মাত্র দু'জন ভারতীয়ের সাথে তাঁর প্রত্যক্ষ আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। তাঁদের একজন কেশবচন্দ্র এবং অন্যজন দ্বারকানাথ। দ্বারকানাথের ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য ও আভিজাত্য ম্যাক্সমুলারের মনে গভীর দাগ কেটেছিল। দ্বারকানাথকে দেখে তিনি শুধু আনন্দিত হয়েছিলেন তা নয়, বিস্মিতও হয়েছিলেন। *অল্ড ল্যাং সাইন* গ্রন্থে ম্যাক্সমুলার দ্বারকানাথ বিষয়ে লেখেন, "পঞ্চাশ বছর আগে ভারতীয়রা এখনকার মতো অবাধে বিদেশ ভ্রমণ করত না। কালাপানি পার হওয়ার জন্য সামাজিক শাস্তির ভীতি তখনও দূর হয় নি। কাজেই ১৮৪৪ সালে যখন প্যারিসে সত্যই একজন খাঁটি হিন্দুকে দেখা গেল, তখন স্বভাবতই হৈ-চৈ পড়ে গেল। আমারও তাঁর সঙ্গে আলাপ করার প্রবল বাসনা হয়। এমনিতেই তিনি সুদর্শন, তার উপর যখন তিনি প্যারিসের সেরা হোটেলের সেরা কামরা ভাড়া করলেন, তখন উৎসুক্য বৃদ্ধি পেল আরও। আমি সে সময় কলেজ-ডি-ফ্রান্সে অধ্যাপক বার্ণফের বক্তৃতা শুনতে যাই। একদিন যখন এই ভারতীয় পরিচয়পত্রসহ অধ্যাপকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন, তখন আমার সঙ্গেও পরিচয় হলো। তাঁকে ঘনিষ্টভাবে জানতেও দেরী হলো না। ভারতের এক মহৎ ও ধনী পরিবারের মুখপাত্র এই দ্বারকানাথ, যাঁর ছেলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আজও জীবিত এবং পৌত্র প্রথম ভারতীয় আই.সি.এস সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

ইউরোপে গিয়ে দ্বারকানাথ শুধু, বিলাসে ও ব্যসনে দিন গুজরান করেন নি। ভাষা

ও সঙ্গীত বিষয়ে তাঁর সেই সময়ের উৎসুক্য তাঁকে আমাদের প্রশংসার যোগ্য করে তোলে। 'ইন্‌স্‌টিট্যুট দ্য ফ্রান্সে' অধ্যাপক বার্ণফ নিজ সম্পাদিত ভাগবতের একটি খণ্ড উপহার দেন। এই গ্রন্থের একদিকে ছিল মূল সংস্কৃত, অন্যদিকে ফরাসী অনুবাদ। দ্বারকানাথ বইটির পাতা উল্টাতে উল্টাতে বলেছেন—"আহা! আমি যদি পড়তে পারতাম।" তাঁর এই আক্ষেপ সংস্কৃত না জানার জন্য নয়, আরও ভালো ফরাসী ভাষা না জানার জন্য তাঁর এই আক্ষেপ। ম্যাক্সমুলার প্রাগুক্ত গ্রন্থে আরও লিখেছেন, "তাঁকে শুধালাম খাঁটি ভারতীয় গান তাঁর জানা আছে কি না। হাসলেন তিনি। ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, 'সে গানের কিছুই তুমি বুঝবে না।' কিন্তু আমি তাঁকে বারবার অনুরোধ করলাম। আবার তিনি পিয়ানোর কাছে গেলেন। তারপর কিছুক্ষণ এলোমেলো বাজিয়ে তিনি আসল গান-বাজনা শুরু করলেন। সত্যি বলতে কি, সেই গান শুনে আমি হতাশ হয়েছিলাম। তাঁর গানের সুর, কথা বা তালমান কোনো কিছুই বুঝলাম না। অকপটে তাঁকে সেকথা বললাম। তিনি বললেন, 'তোমরা সবাই একরকম। যদি তোমাদের কাছে কোনো কিছু নতুন ঠেকে, আর প্রথমবারে যদি সেটা তোমাদের ভালো না লাগে, তবে তৎক্ষণাৎ তাকে বিদায় করে দাও। আমি যখন প্রথমবার ইতালীয়ান গান শুনি, আমার কাছে সেটা আদৌ গান বলে মনে হয় নি। কিন্তু হাল ছাড়ি নি। যতক্ষণ ভালো না লেগেছে ক্রমাগত চেষ্টা করেছি, যাকে তোমরা উপলব্ধি বলো, সেই উপলব্ধি আমার ঘটেছে। সবকিছুর সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য। তোমরা বলো আমাদের ধর্ম নাকি ধর্মই নয়। আমাদের কবিতা আদৌ কবিতা নয়। আমরা কিন্তু পাশ্চাত্যের যা কিছু মহৎ অবদান তাকে বুঝতে চেষ্টা করি। আমরা যেমন তোমাদের গান বুঝতে চেষ্টা করি, তোমরাও যদি সেরকম আমাদের গান বুঝতে চেষ্টা করতে, তবে দেখতে সেখানেও সুর তাল লয় ছন্দ সুষমা সবকিছু আছে, ঠিক যেমনটি তোমাদের আছে, তেমনি আছে আমাদেরও। যদি তোমরা আমাদের ধর্ম ও দর্শন বুঝবার চেষ্টা করতে তবে বুঝতে যে, যাকে তোমরা হিদেন বলো, দুষ্কৃতকারী বলে আখ্যা দাও, আমরা তা নই। সেই অজ্ঞেয়কে জানবার জন্য তোমরা যেমন চেষ্টা করো, আমরাও তাঁকে উপলব্ধির চেষ্টা করি এবং বোধ করি তোমাদের চেয়েও আমরা তাঁকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি।" দ্বারকানাথ ইংল্যান্ড-প্যারিসে গিয়ে ভারতবর্ষের কথা যে বিস্মৃত হন নি উদ্ধৃত অংশটি তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁর এই কথার মধ্য দিয়ে ভারতের সঙ্গীত, কবিতা, ধর্ম বিষয়ে ইউরোপীয়দের অসিহষ্ণুতা আর দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্বধর্ম, স্বমহত্যের প্রতি গভীর উপলব্ধি উচ্চারিত হয়েছে।

প্রাচীনকালের ভারতীয় সমাজে কিছু মানবতাবিরোধী প্রথা ছিল। যেমন কালাপানি পাড়ি দেয়ার ব্যাপারটি। সে সময় কোনো হিন্দুর পক্ষে সমুদ্র পাড়ি দেয়া ধর্মত সম্ভব ছিল না। কালাপনি পার হলে তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো। প্রায়শ্চিত্ত মানে পঞ্চগব্য সেবন। পঞ্চগব্য মানে গোদুগ্ধ, দধি, ঘোল, গোমূত্র ও গোবরের

সংমিশ্রণ। এ ব্যাপারে দ্বারকানাথের তেজি স্বরূপটি ম্যাক্সমুলার এঁকেছেন এভাবে "ব্রাহ্মণদের তিনি একটু হীনচক্ষে দেখতেন। একদিন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, কালাপানি পার হওয়ার জন্য তাঁকে দেশে ফিরে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে কি না। তিনি হেসে জবাব দিলেন, 'না, আমি বহুদিন থেকেই বহু ব্রাহ্মণকে বাড়ীতে প্রতিপালন করছি। সেই তো যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত'।"

ব্রাহ্মণদের হীনচক্ষে দেখতেন, তার মানে এ নয় যে তিনি সাদা চামড়ার ইউরোপীয়দের নিবিড় শ্রদ্ধা করতেন। ইংরেজদের অনেক কিছুর তিনি প্রশংসা করেছেন, আবার ইংরেজ ধর্মযাজকদের কোনো ত্রুটি দেখলে পৈশাচিক উল্লাসে ফেটে পড়তেন তিনি। বহু ইংরেজী সংবাদপত্র দ্বারকানাথ নিয়মিত পড়তেন, তাদের মধ্যে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পত্রিকাও থাকতো। বিশপ বা ক্লার্জিদের পক্ষে শোভন নয় এমন সংবাদটি কেটে তিনি তাঁর নিজস্ব ব্ল্যাকবুকে রেখে দিতেন। যখনই কোথাও খ্রিস্টধর্মের দোষগুণ নিয়ে আলোচনা হতো, অমনি দ্বারকানাথ তাঁর সেই ব্ল্যাকবুক বের করতেন।

স্টকলার সাহেব *ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া* পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন ভারতে ছিলেন। দ্বারকানাথের ইংল্যান্ড অবস্থানকালে এই সাহেবটি ইংল্যান্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন। দ্বারকানাথের ইংল্যান্ডে আগমন সংবাদে স্টকলার তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, "প্রতিষ্ঠাবান হিন্দু দ্বারকানাথ ঠাকুরের লন্ডন আগমনের সংবাদে, যাদের তাঁর সঙ্গে পূর্ব-পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল তারা খুবই খুশি হয়। তাঁর স্বজাতীয়দের মধ্যে তিনি এক দুর্লভ ব্যক্তিত্ব, ভালমন্দ বাছ-বিচারের অদ্ভুত ক্ষমতা ও সম্পূর্ণ স্বাধীন চিত্তের অধিকারী এই মানুষটি অল্প বয়সেই কুসংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করেন এবং নিজে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ না করলেও যে কেহ সত্যানুসন্ধানে ব্রতী হয়েছে তাকেই দিয়েছেন উৎসাহ। একেশ্বরবাদী রামমোহন রায়ের বিলাতযাত্রা এবং দেশবাসীর মধ্যে তাঁর ধর্মমত প্রচারার্থে পুস্তক মুদ্রণের জন্য তিনি অর্থ সাহায্য করেন। বঙ্গদেশের ইউরোপীয়দের কাছে তিনি অতিথি-বৎসল গৃহস্বামী, বাস্তব বন্ধু এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে উদার সাহায্যকারী। এমন কোনো উদ্যোগ ও দরকারী প্রতিষ্ঠান ছিল না যা তাঁর অর্থ সাহায্য বা উপদেশ পায় নি। তিনি সর্বদাই তাঁর নিজ জাতীয় পোশাক পরেন কিন্তু তাঁর জীবনযাত্রা প্রণালী পূর্ণমাত্রায় ইউরোপীয়। জীবনে তিনি উচ্চ শিক্ষা না পেলেও উচ্চতর ইংরেজ সমাজের নরনারীদের সঙ্গে সমপর্যায়ে মেলামেশার ফলে তাঁর ভাষায় ও স্পষ্ট মতামতের ব্যাপারে পরিচ্ছন্ন রুচির ছাপ পড়েছিল।"

ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে দ্বারকানাথের সাথে বহু অভিজাত ধনী ইংরেজের মোলাকাত হয়েছে। অভিজাত প্রতিভার সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য তাঁর আকুলতা এক সময় দুর্বার হয়ে ওঠে। এই আকাঙ্ক্ষার কথা তিনি একদিন স্টকলারকে বললেন।

স্টকলার সেই মত একটি মজলিসের আয়োজন করলেন। বিবরণটি স্টকলারের নিজ জবানিতে শোনা যাক। "এক সপ্তাহের মধ্যেই আমার মায়ের নটিংহিল স্কোয়ারস্থ বাড়ীতে মজলিস বসল। এই বৈঠকে অক্সেনকোর্ড, টম টেইলর, এলবার্ট স্মিথ, গিলবাট বেকেট, হ্যারিসন আইনস্‌ওয়ার্থ, শার্লিব্রুকস, রবার্ট কেলি স্বস্ত্রীক, জর্জ মুর, দ্বারকানাথ ও তাঁর তরুণ ভ্রাতুষ্পুত্র উপস্থিত ছিলেন। এই ভোজে পানীয় দ্রব্য খারাপ ছিল না এবং আমার গৃহিনী খাদ্য-তালিকা প্রস্তুতের ব্যাপারে একটু আন্তরিকতা দেখিয়েছিলেন, কাজেই ভোজনপর্ব বেশ পরিতৃপ্তির মধ্যে সমাধা হলো। দ্বারকানাথের ঠিক পাশেই বসেছিলেন অক্সেনকোর্ড, কাজেই তিনিই একচেটিয়া কথাবার্তা চালালেন। *টাইমস্* পত্রিকার এই কড়া সম্পাদক বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং তাঁকে দেখে মনে হলো, প্রাচ্যে তাঁর সাহিত্য সম্পর্কিত কয়েকটি মূল্যবান প্রশ্নের যথোপযুক্ত উত্তর পেয়ে যেন তিনি পুলকিত হয়েছেন।...যাই হোক এই ভোজসভা হিট করেছিল। তিনিও (দ্বারকানাথ) কফিপানের অবকাশে স্বীকার করলেন, 'খুব আনন্দের মধ্যে সন্ধ্যাটি কাটল। মনে হলো যেন উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজির মধ্যে বসেছিলাম'।"

১৮৪৫ সালের ৮ মার্চ 'বেন্টিঙ্ক' নামক জাহাজে চড়ে দ্বারকানাথ দ্বিতীয়বার অর্থাৎ শেষ বারের মতো বিলেত যাত্রা করেন। সাথে ছিলেন কনিষ্ঠপুত্র নগেন্দ্রনাথ, ভাগ্নে নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং চিকিৎসাবিদ্যা-শিক্ষার্থী চারজন বাঙালী যুবক। পরের বছর অর্থাৎ ১৮৪৬ সালের ১ আগস্ট লন্ডনের নিকটবর্তী সারে নামক স্থানে ৫২ বছর বয়সে দ্বারকানাথ মৃত্যুবরণ করেন। সেদিন ছিল শনিবার। দিনটি ছিল ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ। স্টকলার সেদিনের মর্মস্পর্শী বর্ণনায় লিখেছেন "আমার এই প্রধান হিন্দু বন্ধুটির মৃত্যুতে মর্মাহত হয়েছিলাম। ইংলন্ডে বিলাসী জীবনযাত্রা ও বাণিজ্য সম্পর্কিত উদ্বেগের জন্য তাঁর শরীর অপটু হয়ে পড়েছিল, মাত্র কয়েক সপ্তাহ অসুস্থতার পরে তিনি মারা যান। ঠিক যে সময় তিনি মারা যান, সেসময় লন্ডনের উপর দিয়ে অতি প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যায়। এক দুর্লভ পবিত্র প্রাণ চারিদিকে প্রবল প্রকম্পনে আলোড়িত করে যেন জানিয়ে গেল, সে চলে যাচ্ছে। বজ্রপাতের সেরকম প্রচণ্ড শব্দ, সুদীর্ঘ বিদ্যুল্লতার চোখ ঝলসানো সেই আলো আমি আর কখনো দেখি নি। মহান দ্বারকানাথের আত্মা পার্থিব বন্ধন কাটিয়ে যাওয়ার সময় যে প্রাকৃতিক ঝঞ্ঝা সেদিন দেখেছি, তেমনটি আর্মেনিয়ার পার্বত্য ঝড় বা ভারতের কালবৈশাখীর দিনেও কখনো দেখি নি।"

পৌত্তলিকতায় আবিষ্ট হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য এবং আন্তর্জাতিক উদার দৃষ্টিভঙ্গির জন্য ঊনিশ শতকের ভারতীয়দের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ইউরোপ-আমেরিকার সর্বাধিক আলোচিত ও বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। এই পরিচিতি-তালিকার দ্বিতীয়স্থানে যিনি অবস্থান করছেন, তাঁর নাম প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। পরবর্তী কালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীটি বাংলার সাংস্কৃতিক জাগরণে যে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল, প্রকৃতপক্ষে তার ভিত্তি রচনা করে গেছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর।